গল্পবলার দক্ষতা

প্রফেসর কৃষ্ণ কুমার

বাচ্চাদের গল্প বলা সত্যিই একটা দক্ষতা। এবার দেখা যাক এক গল্প বলায় ক্লাসে কিধরণের সূক্ষ্ম তারতম্য হয়। এটা দুঃখজনক যে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম দুই শ্রেণীতে গল্পবলার জন্য কোনো আলাদা ক্লাস দেওয়া হয় না। যদি এমন একটা কোনো সিস্টেম থাকত, তাহলে হয়ত বাচ্চাদের স্কুলে ধরে রাখার সমস্যাটা কিছুটা হলেও সমাধান করা যেত। অনেকেই হয়ত বলবেন যে আমি একটা ভীষণ বড় সমস্যার গুরুত্বকে অনেক লঘু করে দেখছি। এমনটাও হতে পারে যে হয়ত অনেক উচ্চপদস্থ আধিকারিক আমার এই পরামর্শ শুনে অবজ্ঞার হাসি হাসবেন। তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা আর সাংগঠনিক জ্ঞানের জন্যই হয়ত তাদের মন থেকে সেই সহজ বোধটা হারিয়ে গিয়েছে, যে গল্প বাচ্চাদের উপর যাদুর মত কাজ করে। কিন্তু আমি নিশ্চিত তারাও এরকমই হয়ত কখনো ভাবতেন।

এটা ভাবলে সত্যি দুঃখ হয় যে আমাদের এখানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতেও গল্পবলাকে সেইভাবে গুরুত্বই দেওয়া হয় না। অথচ সেখানে পাঠ্যক্রমে জরুরি জিনিসগুলোর মধ্যে গল্পবলাও যে একটি তা বলা হয়ে থাকে।

আমি সেই দিনটার স্বপ্ন দেখি যেদিন প্রতিটি শিক্ষক যাঁরা বাচ্চাদের পড়ান তাঁদের অন্ততপক্ষে ত্রিশটি চিরাচরিত গল্পের উপর পুরোপুরি দখল থাকবে। দখল অর্থে এখানে আমি বোঝাতে চাইছি যে তাঁদের প্রতিটা গল্প এত ভালভাবে মুখস্থ থাকবে যে তাঁরা গল্পগুলো পুরো আত্মবিশ্বাসের সাথে আর সহজ ভাবে বলতে পারবেন। এটা এমন কোনো বড় ব্যাপার না, বিশেষ করে আমাদের মত দেশে যেখানে এমন পুরানো ঐতিহ্যপূর্ণ হাজার হাজার গল্পের ভাণ্ডার আছে। ত্রিশটি এমন গল্প যা শিক্ষকেরা যখন তখন নিজের খুশীমত শোনাতে পারবেন। আর তেমনটা হলে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রথম দুই শ্রেণীর আবহাওয়াই বদলে যাবে। একটাই শর্ত হল, গল্পবলার গুরুত্বকে স্বীকার করে, প্রতিদিনের পাঠ্যক্রমে গল্পবলাকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ঢোকাতে হবে।

কোথায় পাওয়া যাবে এত গল্প?

কোনোকিছু বলা শুরু করার আগে, প্রথমেই যে বিশেষণটা আমি আগের অনুচ্ছেদে ব্যবহার করেছি সেটাকে বুঝিয়ে বলতে চাই। আমি লিখেছি, আমি সবসময় চিরাচরিত গল্প বলা পছন্দ করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, আমি দেখেছি যখনই শিক্ষকদের গল্প বলতে বলা হয় তখনই তাঁরা প্রচলিত শিশুদের পত্রিকার থেকে গল্প নির্বাচন করেন। কেউ কেউ অমরচিত্রকথা থেকে, আবার কেউ কেউ বড় কৌতুক রচনা বা নিজেদের জীবনের কোনো ঘটনা বলেন। এটা সত্যি যে এগুলোকেও গল্পই বলে, কিন্তু এদের মধ্যে সব গল্প প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছ-সাত বছরের শিশুদের উপর সেই যাদু সৃষ্টি করতে পারে না।

চিরাচরিত গল্পের একটা আলাদাই বৈশিষ্ট রয়েছে যা বিভিন্ন ধরণের আর নানান মাধ্যমে পাওয়া আধুনিক গল্পে দেখা যায় না। ঐ বৈশিষ্টগুলো আলোচনা করার আগে আমি বলব কোথা থেকে পাওয়া যাবে এই চিরাচরিত গল্পগুলো। প্রথমতঃ পঞ্চতন্ত্র, জাতক, মহাভারত, সহস্র রজনী চরিত্র, বিক্রমাদিত্যের গল্প আর আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথা হল এই সব চিরাচরিত গল্পের খনি। এছাড়া, কথাসরিতসাগর, গুলিস্তান, আর বোস্তান এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথা থেকেও কত গল্প পাওয়া যায়। তাই যদি কেউ গল্প বলাকে নিয়মিত বা রোজকার পাঠ্যক্রমে ঢোকাতে চান তাহলে এইসব জায়গা থেকে গল্প বেছে নিয়ে একটা সঙ্কলন করতে পারেন।

একটা গল্প কতটা মূল্যবান

ভালো গল্পের বৈশিষ্ট কি কি সেটা একটা সহজ উপায়ে বোঝা যেতে পারে- বছরের পর বছর ধরে যেসব গল্প বাচ্চারা খুব উৎসাহের সঙ্গে শোনে, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে। পঞ্চতন্ত্রের সিংহ আর খরগোশের গল্প হল এরকমই একটা গল্প। এই গল্পটা আমাদের এত পরিচিত হলেও এই গল্পের প্লট কিন্তু খুব সহজ নয়। যদি প্রথমেই আমরা মনে করে দেখি ঠিক কোনখানে এই গল্প মূল বাঁক নিয়েছিল! সেটা ছিল ঐ দিন যেদিন খরগোশকে সিংহরাজের সামনে হাজিরা দিতে হবে। খরগোশটা পৌঁছাতে এত দেরী করেছিল যে সিংহ ক্ষিদেতে পাগল হয়ে গেছিল। আর সেই রেগে আগুন ক্ষুধার্থ সিংহের সাথে কোনোরকমের দরাদরি করার পক্ষে মোটেও সময়টা উপযুক্ত ছিল না। তবু খরগোশ তার দেরী হবার কারণ বানিয়ে বলল। আরেকটা সিংহের সাথে রাস্তায় দেখা হবার গল্পটা নেহাতই সাজানো, কিন্তু ক্ষিদেয় আর রাগে পাগল রাজা সিংহের সেটা বুঝল না। তাই সে আগে তার প্রতিপক্ষের সাথে বোঝাপড়ার জন্য খরগোশের সাথে কুয়োর কাছে গেল, যেখানে সেই দ্বিতীয় সিংহ থাকত। এইবার এল সেই দ্বিতীয় মোক্ষম সময় যখন খরগোশটা তার নিজের চাতুরির দেখাল। পরের চালটি চালল। আর কুয়োর জলে নিজের ছায়া দেখে অন্য সিংহ ভেবে রাগে গর্জাতে গর্জাতে সিংহ কুয়োতে ঝাঁপিয়ে মরে গেল।

এবার এই বহু পুরানো আর অতিপরিচিত গল্পটাকে আরো গভীরভাবে দেখা যাক। প্রথমত এই গল্পের লেখাতে কোনো জবরদস্তি কিছু চাপানো নেই। বরং অন্য দিক থেকে দেখতে গেলে, এই গল্পটি কিন্তু চরম সত্যের সামনে আমাদের দাঁড় করায়। যেমন, চুড়ান্ত পাশবিক শক্তি বা মৃত্যুর সাথেও কিভাবে চোখে চোখ রেখে লড়াই করা যায়। সাধারণ ভাবে আমরা এসব সত্য শিশুদের সাথে কথা বলার সময় এড়িয়েই চলি, কিন্তু সঙ্গত কারণেই শিশুদের মধ্যেও এনিয়ে অনেক প্রশ্ন বা কৌতুহল আছে। আমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে তাদের এই কৌতুহলের পিছনে কারণটা কি, এনিয়ে একটু পরেই আলোচনা করব। তার আগে আরেকটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে বলব।

এই গল্পটিতে ছোট একটা প্রাণীকে বিশাল বলশালী এক প্রাণীর তৈরি এক সমস্যার জন্য গুরুতর বিপাকে পরতে হয়েছে। তার থেকে মুক্তি পেতে ছোট প্রাণীটা একটা কৌশল অবলম্বন করেছে যেটা সাধারণ দৃষ্টিতে মিথ্যাচার বা অনৈতিক। এই কৌশল অবলম্বন করার মধ্যে দিয়ে খরগোশের ব্যক্তিত্বর বিশেষ কিছু দিক ফুটে ওঠে। সেগুলো হল সাহস, বিপদের সম্মুখীন হয়েও আত্মবিশ্বাসে অটল থাকা, কঠিন সময়েও শেষ পর্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা রাখার অসম্ভব ক্ষমতা এবং নিজের থেকে বয়সে আর শক্তিতে বড় কারোর সামনে নিজেকে সংযত রাখা। আরোও একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কি সুন্দর গতিতে গল্পটা এগিয়ে চলে। শুরুতে, একটা বোঝাপড়া হয়ে এটা স্থির হয় যে প্রতিদিন এক একটি প্রাণী নিজেকে রাজা সিংহের কাছে উতসর্গ করবে। ঠিক তার পরেই, ছোট্ট খরগোশের পালা আসে, আর তখনই গল্পটার মূল বাঁক নেয়। এর পরের ঘটনাগুলো খুব তাড়াতাড়ি এগোয়, কারণ খরগোশটির নিজেকে বাঁচাবার জন্য একটুও সময় নষ্ট করার প্রশ্নই আসে না। গল্পের শ্রোতারা টান টান কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গল্পের মধ্যে নিবিষ্ট হয়। শ্রোতাদের কাছে খরগোশের পক্ষ নেওয়া আর তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরো ব্যাপারটাকে দেখা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। এই ছোট্ট বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়েই বাচ্চাদের মধ্যে এই গল্পটির বিপুল জনপ্রিয়তা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এই গল্প তাদের একটা এমন চরিত্র উপহার দেয় যে হল গল্পের নায়ক আর তার সাথে বাচ্চারা নিজেদের মেলাতেও পারে। সেই চরিত্রটা হল খরগোশ। এই চরিত্রটি গল্পের মধ্যে দিয়ে এমন সব সুখ দুঃখের মধ্যে দিয়ে যায় যা একটা বাচ্চাকেও দৈনন্দিন জীবনে যেতে হয়। একটা শিশুও ছোট্ট আর কমজোড়, তাকেও এমন অনেক কিছুই করতে হয় যা সে করতে চায় না, তারও মনে তার থেকে শক্তিশালী প্রাণীদের প্রতি ভয় আছে। খরগোশটার মত ঘটনা প্রতিটা শিশুর জীবনেও একটার পর একটা আসতে থাকে। যদিও এগুলো আমরা অনেক সময়ই দেখতে পাই না কারণ আমরা শিক্ষক বা পিতামাতার দ্বায়িত্ব পালন করতে এত ব্যস্ত থাকি। যেমন, আমরা খুব কম জনেই জানি মরে যাবার ভয় শিশুদের মনের একটা বড় আশঙ্কা। একটা বড় আর তাদের থেকে অনেক শক্তিশালী প্রাণীর

সম্মুখীন হবার আশঙ্কা তাদের মনে এই দুশ্চিন্তার কারণ। এই গল্পটা গোড়াতেই তাই বাচ্চাদের মনযোগ আকর্ষণ করে, বাচ্চারা তাদের নিজেদের গল্পের মধ্যে খুঁজে পায়। তাদের সেই আকর্ষণ পরের ঘটনাগুলোর মধ্যে দিয়ে ক্রমশ বাড়তেই থাকে। খরগোশ একটা বুদ্ধি বের করে যা খুব কার্যকর হয়। এটা যে শুধু তার সমস্যা সমাধান করে তাই নয়, অন্যান্য প্রাণীদের পক্ষেও একটা বড় সমস্যাকে চিরতরের জন্য নির্মূল করে দেয়। ছোট শিশুরা এমন সবার মঙ্গলকামনায় করা সমাধান খুব পছন্দ করে। শিশুদের কাছে খরগোশের কৌশলটা পছন্দ করার আরেকটা বড় কারণ হল এটা মূলত হল নিষ্পাপ অজুহাত দেওয়ার কৌশল, যে নানান রকমের অজুহাত দেবার প্রবণতা বাচ্চাদের মধ্যেও খুব দেখা যায়। আরো আরেকটা পছন্দ করার কারণ হল খরগোশের অজুহাতটা শুধু তাকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ছিল না, সেটার উদ্দেশ্য ছিল সিংহকেও মারা। আসলে খরগোশটি একটি নিদারুণ উভয়সঙ্কটে ছিল-কারণ অন্যায়কারী সিংহকে না মেরে তার নিজেকে বাঁচানোর উপায় বের করা সত্যি কঠিন ছিল। একই ভাবে, এই গল্পটি বেঁচে থাকার এক অভুতপূর্ব সাহসী সংঘাত কে দারুন নাটকীয় ঢঙে তুলে ধরেছে। এই গল্পের মধ্যে যদি কোনো নীতি শিক্ষা থাকে তবে তা হল আত্মরক্ষা করার নীতি। এই বিশেষ দিকটি আমরা তখন দেখতে পাই যখন আমরা এই গল্পকে একটা শিশুর চোখ দিয়ে দেখি। আর যদি আমরা এটাকে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের চোখ দিয়েও দেখি তাহলেও এটি অবশ্যই একটি কালজয়ী গল্প।

কিসের জন্য গল্পের দরকার?

এতক্ষণে এটা তো স্পষ্ট করা গেছে যে শিশুদের জন্য গল্পে সবসময় নৈতিকতার শিক্ষা অথবা উপদেশ থাকতে হবে তা নয়, অন্ততপক্ষে সরাসরিভাবে তো নয়ই। গভীরভাবে দেখতে গেলে, খরগোশ আর সিংহের গল্পের মধ্যে একটা অনুপ্রেরণামূলক ব্যাপার আছে। বিপদের মুখেও মাথা ঠাণ্ডা রাখা কতটা জরুরি এটা এই গল্পের মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে । এই গল্পে আরোও বলা হয়েছে যে উপস্থিত বুদ্ধি আর কল্পনার জোড় কতখানি। কিন্তু একে চিরাচরিত অর্থে নীতিমূলক শিক্ষা বলা যায় না। আসলে চিরাচরিত গল্পগুলো সে অর্থে নীতিশিক্ষা দেয় না। এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হল গল্প বলার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শিশুদের নৈতিক শিক্ষাদান নয়। গল্প বলার অনেক রকম উপকারিতা আর সেগুলি হল এইরকম।

গল্পবলা শ্রোতা তৈরি করতে সাহায্য করেঃ

ভালো শ্রোতা কে? ভালো শ্রোতা সেই যে পুরোটা মন দিয়ে শোনে। এটা কিন্তু সবাই পারে না। এমনকি, যখন সাবেকি তর্ক বিতর্ক চলে, মানুষ তার মাঝেই থামিয়ে কথা বলতে থাকে। অনেকটা যেন এইরকম যে তারা জানে বক্তা কি বলতে যাচ্ছেন। এর আরেকটা কারণ হল শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য না থাকা। এটা এইজন্য হয় যে আমাদের একটা অভ্যাস হল বক্তা যেটা বলতে যাচ্ছে সেটা আগে থেকে অনুমান করে নেওয়ার প্রবণতা। সুশ্রোতা হওয়া আজকের দিনে শুধু একটা দক্ষতা নয় এটা একটা আচরণ যা ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন শিক্ষায় শিখতে উৎসাহিত করা হয়। গল্প বলার মাধ্যমে আমরা শিশুদের মনযোগ দিয়ে শোনার ক্ষমতাকে বিকশিত করতে পারি যা তাদের সারা জীবনের চলার পথে জরুরি অভ্যাস বলে গণ্য হবে। এটা সত্যি খুবই অদ্ভুত যে আমাদের মত দেশে যেখানে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা মৌখিক সংস্কৃতির ভিত এত পোক্ত হওয়া সত্বেও আজ ভালো শ্রোতা খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। আমার অনুমান এই পরিস্থিতির জন্য মূল দায়ী হল ছোটবেলায় গল্পবলা ও শোনার প্রতি অবহেলা। যেন এমন মনে হয় যে আজকের এই আধুনিক যুগে কারুর কাছে বাচ্চাদের গল্প বলার জন্য সময় নেই। আর তার ফলস্বরূপ এই পরিস্থিতি।

গল্পবলা অনুমান করতে শেখায়ঃ

বাচ্চারা যে গল্প ভালবাসে তা তারা বার বার করে শুনতে চায়। এর কারণ একবার তারা যখন পুরো গল্পটা জেনে যায়, তাকে নিজের করে নেয়, তখন পরের বার থেকে তারা নিজেদের শ্রবনশক্তিকে পরীক্ষা করে। এই পরীক্ষা কিন্তু অবচেতনে আপনা থেকেই স্বাভাবিক ভাবে চলতে থাকে। বাচ্চারা

খুশি হয়ে যায় এই ভেবে যে তারা আগে থেকেই সঠিকভাবে বলে দিতে পারে এরপরে কি হতে চলেছে। এই আগে থেকেই কি হতে চলেছে বলে দেবার ক্ষমতা তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় আর তা তাদের আরো গভীর ভাবে শুনতে উদবুদ্ধ করে। আর এ্রমনটা হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার গল্পটা শোনার পর থেকে। যখন তারা আগে থেকেই সঠিক বলে দিতে পারে কি হতে চলেছে তখন সেই বলতে পারার আনন্দটা যেন তাদের দক্ষ শ্রোতার পুরষ্কারের কাজ করে। শুধুমাত্র আনন্দ নয়, এটা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতেও সাহয্য করে।

এই আত্মবিশ্বাস বাচ্চাদের সার্বিকভাবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে, বিশেষত পড়তে শেখায় অনেক সাহায্য করে। বিদ্যালয়ের প্রথম দুই শ্রেণীতে এই নিজে পড়তে পারা যে কত বড় একটা বিষয়! আমার লেখা The Child’s Language and the Teacher বইটিতে আমি অনুমান করার ক্ষমতা যে বুনিয়াদি শিক্ষা ও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে কতটা জরুরি তা নিয়ে বিষদে বিশ্লেষণ করেছি। আর অনুমান করতে পারার ক্ষমতা অন্য বিষয় যেমন, গণিত ও বিজ্ঞান নিয়ে লেখাপড়া করার ক্ষেত্রেও অনেক কাজে লাগে। গণিত শিক্ষায় নিয়ম ও তার অনুপালন করে সমস্যার সমাধান কতটা জরুরি তা শেখানো হয়। গল্পেও এরকম অনেক নিয়ম থাকে। এদের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে এই নিয়মগুলো গল্পে একেকটা উপমা, অলঙ্কার বা রূপকের মত করে থাকে। যেমন, এরকম একটা নিয়ম হল মোটামোটি সব গল্পেই দেখা যায় ছোট একটা জন্তু বড় একটা জন্তুকে ঠকিয়ে জিতে গেল। ঠিক এমনটাই হতে দেখা যায় সিংহ আর খরগোশের গল্পেও। বাচ্চারা যখন গল্প শোনে তখন তারা ঠিক গল্পের মধ্যে থাকা অন্তর্নিহিত সেই নিয়মটাকে বুঝে যায়, আর এটা তাদের অনুমান করার ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে।

গল্প আমাদের জগতকে প্রসারিত করেঃ

আমি এখানে সেই জগতের কথা বলছি যা সম্বন্ধে আমাদের মনের বা মাথার মধ্যে একটা ধারণা তৈরি করি। গল্পের মধ্যে দিয়ে সেটা প্রসারিত হয়। মানে, আমরা নিজেদের জীবনে যেসব পরিস্থিতি বা মানুষজনের সম্মুখীন হই নি, গল্পের মধ্যে দিয়ে সেসব পরিস্থিতি বা মানুষজনেদের জানতে ও চিনতে পারি। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এইসব জেনে আমাদের কি হবে? এসব জানা মানে জীবনকে জানা বা চেনা। যদিও আমরা হয়ত নিজেরা এগুলো দেখিনি বা জানিনা, কিন্তু তারা আমাদের বিশেষ করে শিশুদের মানসিক ভাবে বিব্রত করে, এবং জীবনভর করে। যেমন, ছোট বাচ্চারা খারাপ লোকেদের ভয় করে, যদিও তাদের সবার হয়ত খারাপ লোকেদের সাথে সাক্ষাত হয় নি। একইরকম ভাবে, তারা মনের গভীরে খুব ভাল, সুন্দর আর চৌখস লোকজনের সাথেও দেখা হবার জন্য আশা রাখে। শিশুদের মনস্তত্ত্বে আদর্শ সুন্দর বা ভাল আর ভয়ঙ্কর খারাপ বিপর্যয় দুইয়েরই কল্পনা সমানভাবে থাকে। চিরাচরিত গল্পগুলো এই মানসিকতাকেই ছুঁতে চেষ্টা করে, আর তাই তারা বাচ্চাদের মনে এত সাড়া তোলে। গল্পের মাধ্যমে ছোট বাচ্চারা যারা শিক্ষিত হয়ে ওঠে নি, তারা সেই দুনিয়ার পরিচয় পায় যা তাদের দেখা আসল দুনিয়ার চেয়ে অনেক অনেক বড়। আর এই যে তারা অভিজ্ঞতা লাভ করে তা কিন্তু অবান্তর নয় বা কোনো এলোমেলো ধারণা নয়। বরং এই অভিজ্ঞতা তাদের এলোমেলো বিশৃঙ্খল দুনিয়াটাকে অনেক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংগঠিত করে গড়ে দেয়। অন্য অর্থে তার নৈতিকতার একটা ধারণাকেও তৈরি করে দেয়। কমজোড় হলেও লড়াই জেতা যায়, কিন্তু হয়ত বা কখনো কখনো কিছুটা ছল করেও। এরই একটা উদাহরণ পাওয়া যায় যখন খরগোশটি ক্ষিদেয় পাগল সিংহকে মিথ্যা বলে।

গল্প শোনা আর পড়া

সবশেষে এটা বলতেই হয় যে, শিশুদের ভাষাসংক্রান্ত শিক্ষা বিকাশে গল্পবলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শব্দের ভাণ্ডার প্রত্যেকের নিজস্ব সম্পদ। আর তার সাহায্যে আমরা পৃথিবীর প্রতিটা জিনিসকে নিজের মত করে ব্যাখ্যা করতে পারি। আবার অন্যদিকে, শব্দের ভাণ্ডার সামাজিক সম্পদও বটে, যাদের সাহায্যে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি সমাজের অন্য পাঁচজনকে বলে তাদের সাথে ভাগ করে নিতে পারি। এই পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই তা প্রকৃত অর্থ পায়। যেমন ধরা যাক, একজন বাচ্চা তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানে খুব খিদে পেলে ঠিক কিরকম লাগে। এবার এই

গল্পের মধ্যে দিয়ে একটি সিংহ খিদে পেলে ঠিক কি করতে পারে সেটা সে জানতে পারে, আর তাই বলা যায় "খিদে" শব্দের অর্থ তার কাছে আরো প্রসারিত হয়। আর সে বোঝে একটা সিংহের মত প্রাণীর খিদে পাওয়া মানে কি। শিশুরা যত বেশী গল্প শোনে, তত তাদের অভিধানে প্রতটা শব্দের অর্থ আরো প্রসারিত হয়, তাতে অন্যের অভিজ্ঞতাও সামিল হয়। এভাবে দেখতে গেলে, শিশু বয়সে গল্প শোনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় কেউ ভবিষ্যতে কত ভাল পড়তে পারবে। আসলে, গল্পবলার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপরোক্ত চারটে জিনিসই ভাল করে পড়তে পারার জন্যও একই ভাবে জরুরি।

পড়তে পারার সাথে সাথে একটি শিশু ভাষায় ব্যবহৃত নিয়ম আর গঠনপ্রণালীর সাথেও পরিচিত হয়। ভাল করে পড়তে পারাটা অনেকটাই নির্ভর করে কে কতটা বুদ্ধি করে আগে থেকেই কিছু জিনিস অনুমান করতে পারছে তার উপর। ভাষা বিষয়ক সমস্ত নিয়মগুলো জানা থাকলে একটি বাচ্চা সহজেই আন্দাজ করতে পারে একটি বাক্যে বা বক্তব্যে এর পরে কি আসতে পারে। এই দিক থেকে দেখতে গেলে, গল্প বলা একটা শিশুকে শিক্ষিত করতে সাহায্য করে।

গল্প বলার দক্ষতা

কেউ যখন গল্পবলার আর্টটাকে আয়ত্ত করতে চাইছেন, তাঁকে গল্পটা মুখস্থ করার উপর জোড় দিতেই হবে। যিনি গল্প বলছেন, গল্পটাই যদি তাঁর মনে না থাকে তাহলে একটা দারুন গল্পও মাঠে মারা পরবে। গল্প মুখস্থ থাকলে তা একটা আত্মবিশ্বাস দেয় আর গল্পটা খুব সহজেই সুন্দর ভাবে বলা যায়। সহজ বা শান্ত ভাবে গল্প বলাটা খুবই জরুরি কারণ এভাবে বললে যিনি বলেন আর যিনি শোনেন তাঁদের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়। দ্বিতীয়ত, গল্পটি ভাল করে মনে থাকলে বক্তা সেটাকে মূল খসড়া বা ফাঁকা মানচিত্র হিসাবে মনে করে এগোতে পারেন। বক্তা বলার সময় শ্রোতাদের মুড অনুযায়ী সে মানচিত্রে যেমন খুশী রঙ ভরে এগুতে পারেন। গল্পটি ছোট না বড় রাখা হবে সেটাও খুব জরুরি বিষয়। কোনোদিন হয়ত আপনি খুব তাড়াতাড়ি বলে খরগোশটিকে সিংহের সামনে হাজির করিয়ে দিতে চাইবেন। আবার অন্যদিন হয়ত আপনি গল্পের প্রথম ভাগটাকে অনেক ফেনিয়ে বলতে চাইবেন- প্রচণ্ড খিদেয় কিভাবে সিংহের মাথাটা পাগল হয়ে যাচ্ছিল বা সিংহের গুহার সামনে যাবার সময় খরগোশটির মনে কি রকম সব খেয়াল আসছিল। গল্প বলতে বলতে বাচ্চাদের সাথে কথপোকথনের মধ্যে দিয়ে এমন নানান রকমের খেয়াল খুশী আপনার মনে জাগতে পারে। যদি পারেন, খরগোশ আর সিনহের জন্য দুইরকমের গলা ব্যবহার করে নাটকীয় ভাবে বলতে পারেন, হাত পায়ের ভঙ্গীও করা যেতে পারে। হাত পুতুল ব্যবহার করে গল্প আর সংলাপগুলো আরও জীবন্ত করে তোলা যেতে পারে। আরও ভাল হয় যদি নিজেই দুইটা চরিত্র সেজে ক্লাস রুমের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত চলতে চলতে নাটকের মত করে সব সংলাপ বলা যায়। এইসবই গল্পটা বলার নানান আকর্ষনীয় পদ্ধতি। আর এই সব রকমের পদ্ধতি একই গল্প বছরের পর বছর ধরে নানান রকম করে বলার সুযো করে দেয় আর গল্পবলার দক্ষতাকে পরিশীলিত করে। একজন শিক্ষকের জীবনও কখনো একঘেয়ে হয় না যদি গল্পবলা প্রতিদিনের তালিকায় যুক্ত হয়। কিন্তু মূলকথাটা হল রোজকার রুটিনে গল্পবলাকে ঢোকাতে গেলে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমকে অন্যরকম ভাবে দেখতে হবে।

গল্পঃ বুদ্ধিমান খরগোশের গল্প

বহুবছর আগেকার কথা। এক জঙ্গলের রাজা ছিল এক ভয়ানক রাগী সিংহ। পেটের খিদে মেটাবার জন্য রোজ শিকার করে করে সে ক্লান্ত হয়ে গেছিল। সে ভাবল রোজ রোজ এভাবে শিকারের পিছনে ছোটার থেকে যদি একেকদিন একেকটা প্রাণী নিজের থেকেই তার কাছে আসে, তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়, আর যেহেতু জঙ্গলের সবাই তাকে চোখ বন্ধ করে মানে তাই এতে অন্য প্রাণীরা কেউ আপত্তিও করবে না। সে তাই জঙ্গলের সব প্রাণীদের ডেকে বলল, "প্রজারা শোন। প্রতিদিন আমায় নিজের খিদে মেটানোর জন্য শিকার করতে হয়। তার জন্য সারা জঙ্গল আমায় ভয় করে। আমি প্রতিদিন একটাই করে প্রাণীকে মারি আর খাই, তবু সবাই সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে। তাই এর একটা সহজ সমাধান করলে হয় না! রোজ সকালে এক একটা করে প্রাণী নিজের থেকেই আমার কাছে এসে

যাবে আমার খাওয়ার জন্য। তোমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতে পার কে কবে আসবে। এতে করে আমায় রোজ রোজ শিকারের ঝক্কি পোহাতে হবে না। আর এতে করে তোমরাও সবাই নির্ভয়ে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারবে।"

বনের সব জন্তু জানোয়ারেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একমত হল যে এটা সবার জন্যই ভাল হবে। তারা ঠিক করল যে প্রতি সন্ধ্যেবেলা একটা করে লটারি করা হবে। লটারিতে যে মোড়কটি উঠবে, তার মধ্যে যার নাম থাকবে, তাকে পরেরদিন সিংহের ক্ষুধা মেটাতে হবে। এই মতই চলতে লাগল। প্রতি সন্ধ্যায় একটা করে মোড়ক তোলা হয়, তাতে যার নাম থাকে সে পরেরদিন সিংহের গুহায় নিজে গিয়ে হাজির হয়। যার নাম ওঠে, তার জন্য এটা খুব খারাপ হলেও অন্য প্রাণীরা অন্ততপক্ষে মনের আনন্দে জঙ্গলের সবখানে ঘুরে বেড়াতে পারে, তাদের সিংহের পেটে যাবার ভয় দূর হয়।

এই নিয়মমাফিক ভালই চলছিল। একদিন সন্ধ্যেবেলার লটারিতে, খরগোশের নাম উঠল। সে সবার সামনে ঘোষণা করল যে তার সিংহের পেটে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই।

তাই শুনে শিয়াল বলল, "দেখ ভাই, যবে থেকে আমরা এইটা মেনে চলছি, সিংহ তার কথা রেখেছে আর আমরাও যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারছি।

বাঁদর বলল, "খরগোশ ভাই, তুমি যদি না যাও তাহলে তো ভাই আমাদের সবাইকে তুমি বিপদে ফেলবে।"

"আমি এই অদ্ভুত নিয়ম একেবারে খতম করে দেবো, সবার জন্য আর চিরদিনের জন্য।" খরগোশটি জোড়ের সাথে বলল আর এও বলল যে তার মনে হয়, "আর তার জন্য তোমরা সবাই আমায় ধন্যবাদ দেবে।"

মোরগ বলল, "যদি ঐ সিংহ আবার শিকার করা শুরু করে রোজ, তাহলে আমরা মোটেও তোমায় ধন্যবাদ জানাবো না।"

এর উত্তরে খরগোশ বলল, "তোমরা পুরোটা আমার উপর ছেড়ে দাও।" আর সে আরামসে শুতে গেল।

সে শুয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবতে লাগল কিভাবে সে নিজেকে আর তার বন্ধুদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে, আর তার সাথে সাথে এই দুষ্ট সিংহের হাত থেকে পুরো জঙ্গলটাকে বাঁচাবে। এইভাবে যখন ভোর হবে হবে তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভালভাবে সবদিক ভেবে যখন সে নিশ্চিন্ত হল যে এই বুদ্ধি খাটিয়ে সে সিংহকে জব্দ করতে পারবে তখন সে মনের শান্তিতে ঘুমাতে গেল। সিংহের গুহায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে তার অনেক বেলা হয়ে গেল। সূর্য তখন মাথার উপরে। সিংহ তখন অধৈর্য হয়ে খিদের চোটে গর্জন করছে। সে ভীষণ রকম রেগে গেছে তার প্রথম কারণ হচ্ছে খরগোশের এই দেরী করা একপ্রকারে তাকে অসম্মান করা আর দ্বিতীয়ত তার খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড। এমন সময় যখন পায়ে পায়ে খরগোশটা গুহায় প্রবেশ করছে, সিংহ গর্জে উঠল, "এটা কি তোমার আসার সময়?"

"হ্যাঁ, মহারাজ", খরগোশ শান্ত স্বরে জবাব দিল।

"তুমি অনেক দেরী করে এসেছ। কেন? " রেগেমেগে সিংহ জানতে চাইল।

"বলব, আমি সব বলব, মহারাজ", খরগোশ বলল। "আমি যখন আপনার কাছে আসছিলাম আমার পথ আটকায় আরেক সিংহ। সে বলে আমি কিছুতেই আপনার কাছে আসতে পারব না কারণ আমায় সে খেতে চায়। আমি কত করে বলি যে তা কিছুতেই হতে পারে না। কারণ আমায় এই জঙ্গলের যিনি রাজা সেই সিংহ মহারাজের কাছে যেতে হবে। এটাই তাঁর নির্দেশ। সেই শুনে সে তো আরও রেগে ওঠে আর বলতে থাকে যে সেই তো এই জঙ্গলের রাজা। আর আমায় বলে আপনাকে এসে বলতে যে, সেই

হল এই জঙ্গলের রাজা আর আপনি তার রাজ্যে ঢুকে পরেছেন। সে আসবে আপনাকে মারতে। সে আরও বলে জঙ্গলের সব জন্তু জানোয়ারদের বলে দিতে যে জঙ্গলের আসল রাজা এসে গিয়েছে আর সে নকল রাজাকে, মানে আপনাকে এবার হটিয়ে দেবে। আর এই জন্যেই তো এত দেরী, মহারাজ", খরগোশটা আরো বলে চলে, "আমায় আপনি খাবার আগে আমি তাই আপনাকে সাবধান করে দিতে চাই যে আপনার খুব বিপদ।"

খিদেয় আর রাগে গর্জাতে গর্জাতে সিংহ বলল, "আমায় বলে নকল! সে নকল। আমায় শিগগিরি ওর কাছে নিয়ে চল। আমি ওকে দেখাচ্ছি কে জঙ্গলের রাজা।"

এই বলতে খরগোশ তাকে নিয়ে চলল। খরগোশ আগে আগে আর সিংহ তার পিছে পিছে চলতে থাকল।

"এবার সবধানে চলুন, আমরা ঐ দুষ্টের গুহারর সামনে পৌঁছাচ্ছি", খরগোশটা খুব ফিসফিস করে বলল।

আসলে খরগোশটা সিংহকে একটা গভীর কুয়োর কাছে নিয়ে যাচ্ছিল। সেখানে পৌঁছে, সে সিংহকে দাঁড়াতে বলে নিজে পা টিপে টিপে কুয়োর কাছে গেল। তারপর পাড়ের থেকে নীচে জলের দিকে খুব ধীরে ধীরে তাকাল। সে তার নিজের ছোট মুখের স্পষ্ট প্রতিবিম্ব দেখতে পেল জলের মধ্যে। এরপর সে সিংহকে ডাকল আর বলল, "দেখুন, নীচে দেখুন মহারাজ। এই হচ্ছে সে যে আপনার রাজ্যের নিয়ম ভাঙতে চাইছে।"

সিংহ কুয়োর একদম ধারটাতে এসে ভীষণ জোড়ে গর্জন করে হুংকার ছাড়তে লাগল। আর সে যখন নীচে দেখল সেখানেও সে এক সিংহকেই গর্জন করতে দেখল, যে কিনা তার দিকে তাকিয়েই গর্জাচ্ছে। সে ঝাপ দিল তার শত্রুকে লক্ষ্য করে আর কিছুক্ষন ঝটপট করার পর ডুবে গেল।

সাথে সাথে খরগোশ ফিরে গেল অন্য সব প্রাণীদের কাছে। তাদের জড়ো করে সে বলল যে তাদের দুঃখের দিন এবার শেষ, কারন সে সিংহকে মেরে ফেলেছে। তারপর সে সবাইকে পুরো ঘটনাটা বলল, কিভাবে সে সিংহকে মেরেছে। সবাই তার সাহসিকতার জন্য তাকে অনেক প্রশংসা করল। আর সেই দিন থেকে, সব প্রাণীরা কোনো সমস্যা বা বিপদে পড়লে খরগোশের কাছে যেতে শুরু করল পরামর্শ আর বুদ্ধি নেবার জন্য। আর এইভাবে সে "জ্ঞানী খরগোশ" নামে বিখ্যাত হয়ে গেল।

প্রফেসর কৃষ্ণ কুমার একজন খুব বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং লেখক যিনি শিক্ষাব্যবস্থা আর তার সমস্যাগুলো নিয়ে ভাবেন ও লেখেন।